প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা :
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও প্রায়োগিক পর্ব

গালিব আহসান খান*

সারসংক্ষেপ

আমাদের মাতৃভূমিকে আমরা একটি সুন্দর রাষ্ট্রে পরিণত করব এটাই স্বাভাবিক। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে রাষ্ট্রের জন্যে একটা সুন্দর কাঠামো, যেখানে দুর্নীতি থাকবে না, অন্যায়-অবিচার থাকবে না। এর জন্যে প্রয়োজন হবে নৈতিক আদর্শকে রাষ্ট্রের প্রশাসন-ব্যবস্থার মধ্যে বাস্তবায়ন করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট; দেখানো হয়েছে অতীতে উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রে প্রশাসনিক সংকট কিভাবে সমস্যা তৈরি করেছিল এবং এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন চিন্তাবিদ কিভাবে ভূমিকা রেখেছেন। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছিল তারও একটা জোরালো চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধে। পরিশেষে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের কী করণীয় হতে পারে সে বিষয়েও একটা প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্ঞানের শাখা যেটাই হোক না কেন, জ্ঞানের শাখা বলেই এমন শাখার পরিধির মধ্যে কর্মরত একজন ব্যক্তিকে জানতে হবে, নিদেনপক্ষে বুঝতে হবে যে, জ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝব বা জ্ঞানের চিন্তা আমরা কিভাবে করব। অন্যথায় আমরা হয়তো ভুল বা অনাকাঙ্ক্ষিত কিছুতে জড়িয়ে যাব। এমন ঝুঁকি দূর করার জন্যে জানতে হবে জ্ঞানের মৌলিক দিকগুলো— যা জ্ঞানের যেকোনো ক্ষেত্রেই আবশ্যক বিষয়। জ্ঞানের এমন একটি দিক হলো, যাকেই আমরা জ্ঞান বলে দাবি করব, সেটাকে সত্য হতে হবে এবং সে দাবির পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ থাকতে হবে। কিন্তু সমস্যাটা হলো, প্রমাণযুক্ত ও সত্য চিন্তা ও চর্চা খারাপ উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হতে পারে, যা বয়ে আনতে পারে মানুষের অমঙ্গল। এমনটা ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। জ্ঞানের এমন অপব্যবহার কোনো ক্ষুদ্র ও বিশেষ প্রেক্ষাপটেও ঘটতে পারে সূক্ষ্মভাবে, যা মানুষের জন্যে অকল্যাণকর যদিও তা থেকে যেতে পারে দৃষ্টির অন্তরালে, ওই সূক্ষ্মতার কারণেই। এমন পরিপ্রেক্ষিতের প্রতিরোধের জন্যে একান্তভাবেই আবশ্যক নৈতিক আদর্শ এবং তা বাস্তবায়ন। এভাবেই জ্ঞানের নানা শাখায় গড়ে উঠেছে দার্শনিক মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষভাবে নীতিবিদ্যার দিকটি। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার উন্মেষ ও বিকাশ এভাবেই হয়েছে। বিষয়টিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব আমি।

প্রাচীন যুগে দর্শনের উদ্ভবের সময় থেকেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় পরিপ্রেক্ষিতে নীতিবিদ্যা ছিল দর্শনের অন্যতম মূল বিষয়। এর কারণ, দর্শনের আলোচ্য বিষয় হলো জীবন ও জগতের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের মৌলিক বিষয় এবং নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তুও সামগ্রিকভাবে জীবনের মৌলিক বিষয়— যেমন, ভালো জীবন বা আদর্শ জীবন কী বা 'ভালো' বলার অর্থ কী, এ ধরনের মৌলিক প্রশ্ন। এভাবেই যুগ যুগ ধরে এসব বিষয়ের আলোচনা হয়েছে, যদিও বাস্তবে আমরা এমন আদর্শকে বা ভালোকে যথার্থ অর্থে পূর্ণভাবে পাইনি। না পাওয়ার এই শূন্যতার অন্যতম মূল কারণ

*ইউ জি সি প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নীতিবিদ্যার আলোচনাকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমিত রাখা এবং পরিণামে এমন আলোচনার বাস্তবায়ন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই বাস্তবতার পরিবর্তন হয়েছে ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা হলো নীতিবিদ্যার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিকেরই একটা অংশ।

ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার বিবিধ দিকের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা নীতিবিদ্যা, ব্যবসায় নীতিবিদ্যা, সাংবাদিকতার নীতিবিদ্যা, পরিবেশ নীতিবিদ্যা ইত্যাদি। এই দিকগুলো সমাজ, রাষ্ট্র ও মানব জীবনের কতগুলো বিশেষ দিক। এই দিকগুলো মানব জীবনের বিবিধ দিকের সাথে ভিন্নভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু প্রশাসন-ব্যাবস্থা মানব জীবনের সাথে সামগ্রিকভাবে যুক্ত। চিকিৎসা, ব্যবসা, সাংবাদিকতা, পরিবেশ ইত্যাদি সবগুলো দিকই এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ ও মানবজীবন পরিচালিত হয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। এভাবে কর্মহীন, দরিদ্র ও অসহায় মানুষও যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বাস করে, তাই তার জীবনও গণ্ডিবদ্ধ থাকে বহুলাংশে প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থার অধীনে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা হবে মানবজীবনের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিকের জন্য সামগ্রিকভাবে প্রাসঙ্গিক একটি দিক এবং এ কারণে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার উদ্ভব এবং গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা হবে এখানে আমার লক্ষ্য।

প্রশাসন-ব্যবস্থা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি দিক। রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নিয়ে দার্শনিক আলোচনার সূচনা প্রাচীন যুগে হয়েছিল। প্রাচীন যুগের আলোচনার ধারাবাহিকতা আধুনিক যুগে চলমান থাকলেও এটা ছিল রাষ্ট্র-কাঠামো বিষয়ক। আলোচনার এই ধারাবাহিকতায় প্রাধান্য পেয়েছিল রাজতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের ধরন, গঠন ইত্যাদি বিষয়। আধুনিক যুগে এসে রাজতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে গণতন্ত্রের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র কাঠামোটা ছিল আলোচনার মূল বিষয়।

আধুনিক যুগে শিল্পবিপ্লবের (industrial revolution) মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে এবং রাষ্ট্র-কাঠামো বহুলাংশে পুঁজিবাদী আদর্শ দিয়ে পরিচালিত হতে থাকে। রাষ্ট্র-কাঠামোর ওপর পুঁজিবাদী আদর্শের ব্যাপক প্রভাব থাকলেও রাষ্ট্রের জনগণের বৃহত্তর অংশের কল্যাণের জন্যে পুঁজিবাদের সহায়ক ভূমিকা সীমিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে পুঁজিবাদের বিকল্প ব্যবস্থা, যেখানে বৃহত্তর জনসমষ্টির অর্থনৈতিক কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এই দ্বৈত বিকল্পের দ্বন্দ্ব বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্র-কাঠামোর গঠন ও ধরনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (welfare state) ধারণা ও বাস্তবতা, যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র-কাঠামোর ধরন ও গঠন নির্ধারিত হয় জনগণের কল্যাণের চিন্তা দিয়ে। উপরিউক্ত দ্বৈত বিকল্পের দ্বন্দ্ব নিরসনের দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণের কল্যাণের চিন্তা পরিণত হয় রাষ্ট্র-কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে। জনগণের কল্যাণের জন্যে আবশ্যক একটা সুষ্ঠু জনপ্রশাসন (public administration) এবং সুষ্ঠু জনপ্রশাসনের জন্য আবশ্যক নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধের দিক-নির্দেশনা। এভাবেই গড়ে উঠেছে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা (administrative ethics)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশেও একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়' শিরোনামে। আরো উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ২০১২ সনের অক্টোবর মাসে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল* শিরোনামে। এ বইটির শুরুতেই লেখা আছে, 'শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়'।[১] আধুনিক যুগে পর্যায়ক্রমে এভাবে গড়ে ওঠা জনপ্রশাসনের ধারণা এবং নৈতিক শুদ্ধাচারের ধারণার সমন্বয় থেকে গড়ে উঠেছে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার উদ্ভবের সময়ানুক্রমিক ঐতিহাসিক চিত্রটি আমি এখানে প্রথমে তুলে ধরব।

প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার উদ্ভবের ভিত্তিতে ছিল প্রশাসনিক ব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত। এই নঞর্থক বাস্তবতা সবচেয়ে প্রকটভাবে প্রকাশ পায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সময়ের অনৈতিক কার্যক্রমে। ১৮৮০ সনে

---

১. দ্রষ্টব্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৫।

প্রকাশিত *Civil Service in Great Britain: A History of Abuses and Reforms and Their Bearing Upon American Politics* শীর্ষক গ্রন্থে ডরমেন এটোন তুলে ধরেন তৎকালীন ব্রিটিশ জনপ্রশাসন ব্যবস্থার অনৈতিক দিকগুলো। এটোনের এই রচনাকেই টেরি কুপার বিবেচনা করেছেন প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার সূচনা (starting point) হিসেবে। এটোনের মতাদর্শের আলোকে কুপার মনে করেন, সিভিল সার্ভিসের সংস্কার করা মূলত (fundamentally) একটি নৈতিক কাজ।[২]

প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার সূচনা এভাবে হলেও জ্ঞানের এ ক্ষেত্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জন করতে সময় লেগেছে প্রায় একশ বৎসর; অর্থাৎ, এটোনের ১৮৮০ সনের রচনা থেকে প্রসাশনিক নীতিবিদ্যা বিষয়ক চিন্তার সূচনা হলেও ১৯৭০-এর দশকে এসে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে। ১৮৮০ এবং ১৯৭০-এর মধ্যবর্তী এ সময়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-ব্যবস্থার নীতিবিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং অসন্তোষ। প্রশাসনিক ব্যবস্থার নীতিবিচ্যুতিকে পরিহার করার জন্যই প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার অত্যাবশ্যকতাকে অনুভব করেন এ ক্ষেত্রের বিশিষ্ট কিছু চিন্তাবিদ। প্রশাসনিক নীতিবিচ্যুতি বিষয়ে জোরালো অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে এটা বলার মধ্য দিয়ে যে, পাবলিক অথোরিটিকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার কার্যক্রম ঘটেছে দীর্ঘ সময় জুড়ে এবং 'এটা ইংরেজ জাতির নৈতিক বোধকে অশুদ্ধ এবং অসার করে দিয়েছিল'।[৩]

পাবলিক অথোরিটিকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করা হয় — উপরিউক্ত এ কথাটির সাধারণ অর্থে এটা মনে করা যায় যে, পাবলিক অথোরিটি ছিল ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, অতীতে ক্রীতদাসদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু যারা রাষ্ট্র-পরিচালনার সাথে যুক্ত এবং যারা পাবলিক অথোরিটি তারাও যদি পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয় তাহলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্যে পরিণত হবে। এমন বাস্তবতায় রাষ্ট্র হবে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। এমন পরিপ্রেক্ষিত থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং জলদস্যুপ্রবণ অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল; পরিণামে ব্রিটিশ সরকার জলদস্যুপ্রবণ কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রমকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পরিণত করেই ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল ব্রিটিশ সরকার। এটা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের ব্রিটিশ প্রশাসন-ব্যবস্থার বেদনাদায়ক বাস্তবতা। এই বাস্তবতা প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর পল ডগলাস বলেন, দুই শতাব্দী পূর্বে ব্রিটেন ছিল দুর্নীতির ময়লা নিষ্কাষণের একটা গর্ত (sinkhole of corruption); অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লন্ডন ছিল একটা দুর্বৃত্ত-অধ্যুষিত (gang-ridden) শহর যেখানে পুলিশ-মেজিস্ট্রেটদের অনেকেই অপরাধী সিন্ডিকেটের সাথে মৈত্রীবদ্ধ ছিল।[৪] পল ডগলাস তাঁর আলোচনায় তৎকালীন ব্রিটেনের প্রশাসন-ব্যবস্থার সংকটের আরো নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন; এর মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার উদ্ভবের পটভূমি স্পষ্ট হয়েছে।

ইংরেজ প্রশাসনব্যবস্থার এই সংকট আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনব্যবস্থাকেও প্রভাবিত এবং ত্রুটিপূর্ণ করেছিল একইভাবে। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে উঠেছিল পাঁচ-শতাংশধারী (five-percenter) নামের ব্যক্তির অস্তিত্ব। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির ১৯৪৯ সনের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি প্রজেক্টের জন্য যে আর্থিক বরাদ্দ দেয়া হবে, সেই অর্থের ৫% নেবেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রশাসনের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রজেক্টটি পেতে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করবেন। যুক্তরাষ্ট্রে সে সময়ে এমন মানুষের নাম দেয়া হয়েছিল 'five-percenter' man বা পাঁচ-শতাংশধারী মানুষ।[৫] Five-percenter বা পাঁচ-শতাংশধারী মানুষের এমন কার্যক্রম থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন-ব্যবস্থায় অনৈতিক কার্যক্রম এবং সমস্যা তৈরি হয়েছিল, যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের

---

২. Cooper, T. L., ed., *Handbook of Administrative Ethics*, New York: Marcel Dekker, Inc., 2nd edition, 2001, p. 2.

৩. Eaton, উদ্ধৃত, দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২। এ মতটি D. B. Eaton প্রকাশ করেছিলেন ১৮৮০ সনে প্রকাশিত তাঁর *Civil Service in Great Britain: A History of Abuses and Reforms and Their Bearing Upon American Politics* শীর্ষক গ্রন্থে, New York: Harper and Brothers.

৪. Douglas, P. H., *Ethics in Government*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1953, p. 12.

সিনেট তদন্ত কমিটি গঠন করে। সিনেটর ফুলব্রাইট ছিলেন এ তদন্তের মূল দায়িত্বে। এতদসংক্রান্ত তদন্তের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকে সিনেটর পল ডগলাস তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন প্রশাসন ও নৈতিকতা বিষয়ে; প্রবন্ধ তিনটি ১৯৫২ সনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা হয়েছিল; এভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল সিনেটর পল ডগলাস রচিত *Ethics in Government* শীর্ষক গ্রন্থটি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রশাসন ব্যবস্থায় অনুরূপ সংকট ঘটেছিল আরো নানাভাবে, যেখানে নৈতিক বোধের অপ্রতুলতাই ছিল ভুল সিদ্ধান্তের মূল কারণ। জনপ্রশাসন ব্যবস্থার সংকট বিষয়ে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন এ বিষয়ের বিভিন্ন গবেষক; এটা ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন-ব্যবস্থায় কেবল দক্ষতাকে গুরুত্ব দেয়া হতো এবং এই বাস্তবতা এতটাই জোরালো হয়ে উঠেছিল যে, 'দক্ষতা' (efficiency) শব্দটি সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনব্যবস্থার স্লোগানে পরিণত হয়েছিল।[৬]

এখানে লক্ষণীয় যে, দক্ষতা হলো এক ধরনের কর্মক্ষমতা; এমন কর্মক্ষমতা গড়ে ওঠে কাজ করার কৌশল এবং তা প্রয়োগের সামর্থ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে। এমন কৌশল এবং সামর্থ্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষের মন-মানসিকতারও একটা জোরালো ভূমিকা থাকে। কিন্তু সমস্যাটা এখানে যে, মানুষের মন-মানসিকতা কখনো চালিত হয় চিন্তাশীলতা ও যৌক্তিকতা দিয়ে, আবার কখনো চালিত হয় আবেগ-অনুভূতি দিয়ে। এটাও বাস্তবতা যে, জনগণের মধ্যে যুক্তির চেয়ে আবেগ বেশি ভূমিকা রাখে। এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দক্ষতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চালিত হয় আবেগ দিয়ে এবং তা যৌক্তিকতাকে জোরালো রাখতে ব্যর্থ হয়। এভাবেই দক্ষতা এবং এর প্রয়োগ থেকে নানা সংকট গড়ে ওঠে।

এটাও সত্য যে, যুক্তির অপপ্রয়োগও ঘটে থাকে, যেমন strong-arm method[৭] বা পেশি-শক্তির যুক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যুক্তি প্রয়োগ করার এক ধরনের ক্রটিপূর্ণ প্রয়াস বাস্তবে দেখা যায়, যার দৃষ্টান্ত প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থেও আমরা পেয়েছি। এভাবে দক্ষতা পরিচালিত বা ব্যবহৃত হতে পারে পেশি-শক্তির যুক্তি দিয়ে, অর্থাৎ অন্যায়ভাবে। এভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দক্ষতাকে যদিও জোরালো গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, তবু এটা ছিল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্বলতার দিকে নিয়ে যাওয়া। এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় ছিল দক্ষতাকে সঠিক পথে পরিচালনার বিধিমালা; এবং এমন বিধিমালা আসবে নীতিদর্শন থেকে। এই প্রেক্ষাপট থেকে মার্শাল ই. ডিমোক গুরুত্ব আরোপ করেন বৃহত্তর প্রশাসনিক দর্শনের বাঞ্ছনীয়তার ওপর, যেখানে বিশ্বস্ততা, সততা, জোরালো কর্ম-প্রবণতা ও নম্রতার সদগুণ এবং চরিত্র ও আচরণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থাকবে — যা ফলপ্রসূ ও সন্তোষজনক কাজে অবদান রাখবে।[৮] প্রশাসনিক দর্শনের এই দিকগুলো নীতিদর্শনেরই দিক। একই দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রিজ মরস্টাইন মার্কস বলেন যে, প্রশাসনিক দায়িত্ববোধের হৃৎপিণ্ড (heart of administrative responsiblity) হলো আদর্শগত ও পেশাগত কর্মবিধি দ্বারা গঠিত কর্তব্যের প্রত্যয়।[৯] উল্লেখ্য, কর্তব্যের প্রত্যয় নীতিবিদ্যারই একটি মৌলিক দিক; দর্শনের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতাদর্শ হলো, কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে কর্তব্য করাই হলো নীতিবিদ্যার মূলনীতি। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার উদ্ভবের এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত প্রসঙ্গে টেরি কুপার বলেন, ১৯৪০-এর দশকের সময়টা জুড়ে এ বিষয়ের চিন্তাবিদগণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্রটিপূর্ণ দিকগুলোর প্রতি

---

৫. *Cf.*, 'The five-percenter is a man who trys [sic] to obtain contracts for small businessmen upon a contingent fee basis. ... if he does obtain a contract, his fee is usually five percent of the total'. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।

৬. Dimock, M. E., "The Criteria and Objectives of Public Administrations", in Gaus, J. M., White, L. D. and Dimock, M. E., *The Frontiers of Public Administration*, Chicago: Chicago University Press, 1936, p. 116.

৭. *Cf.*, Copi, I. M. and Cohen, C., *Introduction to Logic*, New Delhi: Prentice-Hall of India, 2001, p. 130.

৮. Dimock, M. E., *op. cit.*, p. 132.

৯. Marx, F. M., *Public Management in the New Democracy*, New York: Harper and Brothers, 1940, p. 251.

নির্দেশ করেছেন এবং নীতিবিদ্যার জন্যে একটি নতুন স্থান প্রতিষ্ঠার জন্যে কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভব ঘটে ১৯৭০-এর দশক থেকে।

প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার গুরুত্বের এবং উদ্ভবের এই প্রেক্ষাপট গড়ে উঠলেও একইসাথে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার বিপক্ষেও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। তবে এই বিরোধিতা প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিপক্ষে ছিল না, এটা ছিল মূলত নীতিবিদ্যার বিপক্ষে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমাজবিজ্ঞানের বিষয়; বিজ্ঞানমনস্ক কিছু চিন্তাবিদ ১৯২০-এর দশকের শেষ দিকে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানকে দর্শনের ভাববাদী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে। যেহেতু নীতিবিদ্যা দর্শনেরই একটি শাখা, তাই প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার বিপক্ষেও তাঁরা অবস্থান নিয়েছিলেন। টেরি কুপার বিষয়টির উল্লেখ করেছেন তাঁর আলোচনায়।[১০] বিষয়টিকে আমি এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব।

১৯২০-এর দশকের শেষ দিকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের চারজন অধ্যাপক একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন ভিয়েনা সার্কেল নামে। তাঁদের মতাদর্শকে তাঁরা বলেছিলেন 'Logical Positivism' অর্থাৎ 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ' এবং দর্শনের ইতিহাসে তাঁরা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুনিষ্ঠতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এবং দার্শনিক ভাববাদ থেকে বিজ্ঞানকে পৃথক রাখার জন্যে তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষণ দিয়ে যা যাচাই করা যাবে না তা অর্থহীন।[১১] এভাবে তাঁরা দর্শনকে, বিশেষত অধিবিদ্যা বা metaphysics-কে অর্থহীন বলে বর্জন করেছিলেন, কারণ অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু, যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরতা এবং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদিসত্তাকে (ultimate reality) অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণ দিয়ে যাচাই বা পরখ করা যায় না। একই দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিবিদ্যাকেও তাঁরা অর্থহীন বলে বর্জন করেছেন, কারণ নীতিবিদ্যার তিনটি স্বীকার্য সত্য বা postulate হলো ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা, যার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরতাকে অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণ দিয়ে যাচাই বা পরখ করা যায় না। অন্যদিকে দর্শনের ইতিহাসে অবিতর্কিতভাবেই এগুলোকে নীতিবিদ্যার স্বীকার্য সত্য বলে মেনে নেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজ্ঞানেও অনেক কিছুকেই স্বীকার্য সত্য হিসেবে মেনে নেয়া হয়, যা অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণ দিয়ে যাচাই করা যায় না। নীতিবিদ্যায় উপরিউক্ত স্বীকার্য সত্যকে মেনে নেয়া হয় এ কারণে যে, এ জগতে সব মানুষ তাদের নৈতিক কাজের জন্যে সুফল বা ন্যায়বিচার পায় না; এমন ন্যায়বিচার কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে এবং এ জগতে না হলেও পরকালে পাবার জন্যে আত্মার অমরতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। এমন স্বীকার্য বিষয়কে বা postulate-কে মেনে নিতে হবে, অন্যথায় নৈতিক আদর্শের গুরুত্ব দুর্বল হয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদীগণ যেহেতু তাঁদের বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে এমন বিষয়কে বর্জন করেছেন এবং অর্থহীন বলেছেন, তাই তাঁদের মতাদর্শ অনুযায়ী নীতিবিদ্যা অর্থহীন এবং গ্রহণযোগ্য নয়। এভাবে প্রত্যক্ষবাদীদের মতানুসারে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রত্যক্ষবাদীগণ এ বিষয়টিকে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, বাস্তবে যা অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষণ দিয়ে যাচাই করা যায় সেগুলো হলো ঘটনা (fact), যা বাস্তবে ঘটে। অন্যদিকে নীতিবিদ্যা হলো মূল্যবোধের (value) বিষয় এবং এখানে বিবেচনা করা হয় কী ঘটা উচিত ও কী ঘটা উচিত নয়।[১২] অর্থাৎ, একদিকে হলো বাস্তব ঘটনা অর্থাৎ কী ঘটে এবং অন্যদিকে হলো উচিত/অনুচিত বিবেচনার মূল্যবোধের দিক। এভাবে fact এবং value বা ঘটনা এবং মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য করে প্রত্যক্ষবাদীগণ যাচাইযোগ্য ঘটনাকেই কেবল অর্থপূর্ণ বলে গ্রহণ করেন এবং উচিত/অনুচিত মূল্যবোধের দিকটিকে অর্থহীন বলে বর্জন করেন।

---

১০. Cooper, T. L., *op. cit.*, p. 11.

১১. ভিয়েনা সার্কেলের উদ্ভব এবং পরখ-নীতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য, গালিব আহসান খান, *বিজ্ঞান, পদ্ধতি ও প্রগতি*, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ২২-৩০।

১২. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য, হিউম, ডে., *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, অনুবাদ, আবু তাহা হাফিজুর রহমান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ. ২৬৫।

কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে, কী ঘটে তার সাথে কী ঘটা উচিত বা অনুচিত, এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক না থাকলে মূল্যবোধ এখানে ব্যাহত হবে এবং যেসব ঘটনা উচিত নয় সেগুলোও ক্রমাগত ঘটে যাবে। এভাবে সমাজে সঙ্কট সৃষ্টি হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার পক্ষে সদর্থক সমর্থনও গড়ে উঠেছে, যেখানে প্রত্যক্ষবাদীগণের মতাদর্শকে প্রশাসনিক চিন্তাবিদগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার পক্ষে যে সকল চিন্তাবিদ এখানে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আর. টি. গোলেমবিয়স্কি, ডাব্লিউ. জি. স্কট, ডি. কে. হার্ট এবং ডি. ওয়ালডো;[১৩] প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার ভালোর জন্যে অধিবিদ্যক চিন্তায় ফিরে আসার (a return to metaphysical speculation) প্রস্তাবও গড়ে উঠেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে।[১৪]

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে চরম উৎকর্ষ ঘটেছে, তার প্রভাব থেকে প্রশাসনিক চিন্তাবিদগণ চেয়েছেন প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত রাখতে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দর্শন ও নীতিবিদ্যাকে বর্জন করতে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঠিক বিপরীত ঘটনাটাই ঘটেছে। প্রশাসন-ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত নয়, বরং মানববিদ্যামূলক হতে হবে বলে মতাদর্শ গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রে নিক্সন প্রশাসনের সময়ে যে ওয়াটারগেট (watergate) সমস্যা ঘটেছিল, সেটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগের বাস্তবতার মধ্যেই ঘটেছিল, যে ঘটনার মধ্যে ছিল না দার্শনিক প্রজ্ঞা, সততা, নৈতিকতা এবং আদর্শগত মূল্যবোধ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সে সময়ের সরকারি প্রশাসন যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল সেটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করেই করেছিল এবং সেখানে ছিল না দার্শনিক প্রজ্ঞা এবং নৈতিকতা। বিশ্বে বিরাজমান এমন প্রশাসনিক সংকট কখনো আসে অল্প মাত্রায় আবার কখনো আসে গভীর মাত্রায়। এমন দৃষ্টিকোণ থেকে মার্শাল ডিমোক বলেন, আমাদের জন্যে এটা উপলব্ধি করা ভালো হবে যে, প্রশাসন হলো একান্তভাবে মানববিদ্যার (humanities) অংশ; এবং প্রশাসন একান্তভাবে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ (wedded) দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস এবং শিল্পকলার সাথে — কেবল প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সংগঠনের সাথে নয়।[১৫] ডিমোক আরো বলেন, প্রশাসকগণ ক্রমবর্ধমান হারে মানবিক এবং দার্শনিক হতে পারেন এবং মানুষের প্রয়োজন ও প্রত্যাশার উপযোগী করে চলমান কর্মধারার (ongoing programs) রূপরেখা দাঁড় করাতে পারেন, যখন তারা জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে যুক্ত হয়ে মনুষ্যত্ব ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৬]

প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে দর্শনের এমন জোরালো যোগসূত্র গড়ে উঠেছে প্রশাসন-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি থেকে। এই অন্তর্নিহিত প্রকৃতি হলো, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়; সমাজ গড়ে ওঠে জনগণকে নিয়ে এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণের প্রশাসন এবং কল্যাণ মানুষের জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। মানুষের চাওয়া-পাওয়া, বেঁচে থাকা, ভালো জীবন অর্জন, মনুষ্যত্বের চর্চা এবং সবকিছুর ওপরে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের সুসামঞ্জস্য বজায় রাখা— এগুলোর জন্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে মানববিদ্যামূলক হতেই হবে। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা এভাবেই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে একটি অপরিহার্য বিষয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার উদ্ভবের প্রেক্ষাপটের একটি ঐতিহাসিক চিত্র আমি তুলে ধরেছি। এ বিষয়ের প্রয়োগ বাস্তবে কিভাবে হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখন তুলে ধরব।

প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক পর্বের বাস্তবায়ন নানা পরিপ্রেক্ষিতে নানাভাবে ঘটেছে। যেমন, কোনো বিশেষ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কেবল সেই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে এটা করেছে; অন্যদিকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এ বিষয়ে নীতিমালাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন করে তা কার্যকর করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলব যে, প্রশাসনকে মানবিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নানা প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছিল উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে;

১৩. Cooper, T. L., *op. cit.*, p. 11.

১৪. দ্রষ্টব্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

১৫. Dimock, M. E., *A Philosophy of Administration*, New York: Harper and Brothers, 1958, p. 5.

১৬. *Loc. cit.*

যেমন, বেল প্রশাসনিক ব্যবস্থা (Bell System) যুক্ত হয়েছিল পেনসেলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে। এটা ঘটেছিল ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে।[১৭] এমন ব্যবস্থার প্রসার ঘটলে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বিবেচিত হবে এবং তা সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক দিকের এমন বাস্তবায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল পর্যায়ে সরকারি কার্যক্রমের নৈতিকতা বিষয়ক অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Office of Government Ethics শিরোনামে এবং ১৯৭৮ সনে Ethics in Government Act প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উচ্চমানের নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে উদ্বুদ্ধ (foster) করা এবং জনগণের আত্মবিশ্বাসকে জোরালো করা যে, সরকারি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে নিরপেক্ষতা ও পূর্ণ স্বচ্ছতার (integrity) সঙ্গে।[১৮] প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক পর্বের এমন বাস্তবতার সাথে যুক্ত ছিল গবেষণা কার্যক্রম। এমন নতুন চিন্তাধারার উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম দিয়েই। দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল American Society of Public Administration (ASPA), যার উদ্যোগে ১৯৫২ থেকে ১৯৯৯ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা বিষয়ে তিরিশটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে।[১৯]

প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রয়োগ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোতেও বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বড় মাপের শহরগুলোতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওয়াশিংটন ডি সি, শিকাগো, নিউ ইয়র্ক এবং এমন নানা শহরে পৃথকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে; শহরগুলো তাদের নিজেদের জন্যে পৃথকভাবে নীতিবিদ্যক কমিশন (ethics commission) গঠন করেছিল।[২০] বিভিন্ন রাষ্ট্র ও শহরের ভৌগোলিক, সামাজিক ও পরিপ্রেক্ষিতগত ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক পর্ব এমন বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করেছিল। এই বহুমাত্রিকতার আরো একটি দিক হলো পেশাগত পরিপ্রেক্ষিত। বিভিন্ন পেশায় নৈতিক মূল্যবোধ পেশাগত বিষয়বস্তু, কার্য-প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী নানা বিশেষ রূপ নিতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবসার ক্ষেত্রে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন ভিন্নতা স্পষ্টতই বোধগম্য। এভাবে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক পর্বে পেশাগত বিবিধ মাত্রাও গড়ে উঠেছিল।

প্রায়োগিক পর্বের উপরিউক্ত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পেশাগত ইত্যাদি নানা পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে মোট চারটি আদর্শগত দিকের ওপর বর্তমানে মূল গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এই চারটি দিক হলো : আনুগত্য, পূর্ণ স্বচ্ছতা, একমতবর্তিতা এবং শুদ্ধতার মডেল।[২১] অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই চারটি দিককেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই চারটি দিকের ওপর বিতর্ক ও ভিন্নমতও ছিল। কিন্তু এসবের মধ্য দিয়েই প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রয়োগ হয়েছিল।

প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক পর্ব কেবল যুক্তরাষ্ট্রে নয়, আরো অন্য দেশেও বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ক্যানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, হংকং ও জিম্বাবুয়ে। এসব দেশে রাষ্ট্রকাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিন্নতা, সমাজ ও সংস্কৃতির ভিন্নতা এবং সময়ের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার নানা বাস্তবতা গড়ে উঠেছিল এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নৈতিকতা বা উচিত/অনুচিত বোধ নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি এখানে জিম্বাবুয়ের বিষয়টি আলোচনা করব এবং উপরে আলোচিত যুক্তরাষ্ট্রের দিকটির সাথে তুলনা করব। যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে উন্নত দেশ মনে করা যায়; কিন্তু জিম্বাবুয়ে স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্র ও জিম্বাবুয়ের এই ভিন্নতা দুই মেরুর ভিন্নতার মতো হবে; প্রশাসনিক নীতিবোধের একটা নতুন মাত্রা পাওয়া যাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে।

---

১৭. *Loc. cit.*

১৮. Hejka-Ekins, A., "Ethics in In-service Training", in Copper, T. L., *op. cit.*, pp. 90-91.

১৯. Copper, T. L., *op. cit.*, pp. 26ff.

২০. Hejka-Ekins, A., *op. cit.*, p. 94.

২১. *Ibid.* p. 97.

জিম্বাবুয়েতে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রকাশিত না হলেও সাদা ও কালোর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও যোগ্যতার ভিন্নতার বৈষম্যের বোধ এবং ভেদাভেদ ঘটেছে যা নিয়ে উচিত/অনুচিত বা নৈতিকতার চিন্তা এবং একই সাথে জাতিভেদ চিন্তাও সামনে এসেছে। জিম্বাবুয়ের এই বাস্তবতায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পটভূমির এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বাস্তবতারও প্রভাব ছিল। জিম্বাবুয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এটা ঘটেছিল ১৮৯৮ সনের ১১ জানুয়ারি তারিখের সরকারি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে, যেটাকে জিম্বাবুয়ের ফরমাল পাবলিক সার্ভিসের সূচনা (beginning of formal public service) মনে করা হয়।[২২]

এই সূচনার মধ্যে জাতিভেদ প্রথা পরোক্ষ বা সুপ্ত আকারে যেটা ছিল তা সময়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। ১৯৩১ সনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসে যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। এই আইনের মধ্য দিয়ে আফ্রিকানরা বাদ পড়ে যায়। কারণ, সে সময়ে জিম্বাবুয়ে ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং আইন প্রণয়ন করেছিল ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ এবং তাদের মানদণ্ডে আফ্রিকানরা যোগ্য বিবেচিত হয়নি। এ বিষয়ে আফ্রিকানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ও চাপ প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সনে একটি কমিটি গঠন করা হয় নতুন বিধিমালা প্রণয়নের জন্যে এবং ১৯৬১ সনে পার্লামেন্টে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়, যে আইন অনুযায়ী আফ্রিকানগণ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করতে পারবে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠে শ্বেতাঙ্গ বিষোদ্গার (backlash), সরকার পতন হয়, গড়ে ওঠে নতুন আন্দোলন এবং পরিশেষে ১৯৮০ সনে জিম্বাবুয়ে মুক্ত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন থেকে।[২৩]

১৮৯৮ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত এই বিরাশি বছরে জিম্বাবুয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে বিবিধ পরিবর্তন ঘটেছে, তার পটভূমিতে ছিল নৈতিক মূল্যবোধ বা উচিত/অনুচিতের দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন, জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা, সমান অধিকারের চেতনা ইত্যাদি। এখানে নৈতিক বোধের প্রয়োগ হয়েছে। প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক পর্বের এটাও একটা দৃষ্টান্ত। জিম্বাবুয়ের এই বাস্তবতার সাথে যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপরে আলোচিত বাস্তবতার তুলনা করি তাহলে তা হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই অর্থে যে, যুক্তরাষ্ট্রেও নৈতিক বোধের বাস্তবায়ন হয়েছিল প্রশাসনিক ব্যবস্থায়। উভয় ক্ষেত্রেই নৈতিক বা উচিত/অনুচিতের বোধ বিরাজমান ছিল। কিন্তু এ দুয়ের সাদৃশ্যের সাথে বৈশাদৃশ্যও রয়েছে। জিম্বাবুয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। প্রশাসনের বিধিমালা একের পর এক প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নতুন বিধিমালা দিয়ে পুরাতন বিধিমালা প্রতিস্থাপিত হয়েছে; পুরাতনকে বর্জন করে নতুনকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সরকারের পতন হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। যুক্তরাষ্ট্রের বিরাজমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক বিধিমালার সাথে নৈতিক শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের দিক যুক্ত করা হয়েছে। উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, Bell system গ্রহণ করেছিল পেনসেলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার কিছু দিক। অন্যদিকে গভর্নমেন্ট এথিক্স অফিস প্রতিষ্ঠিত করা, গভর্নমেন্ট এথিক্স অ্যাক্ট প্রতিষ্ঠিত করা — এই নতুন কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল; এসবের মধ্য দিয়ে বিরাজমান প্রশাসনিক বিধিমালা ও ব্যবস্থাকে জোরালো ও সমৃদ্ধ করা হয়েছিল, পরিমার্জিত করা হয়েছিল, বর্জন বা প্রতিস্থাপন করা হয়নি। জিম্বাবুয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক পর্বের এই বৈসাদৃশ্যের মূল কারণ হলো, জিম্বাবুয়ের প্রশাসনিক নীতিমালা ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল বিপরীত, অর্থাৎ প্রশাসনিক নীতিমালা ত্রুটিপূর্ণ ছিল না বরং নীতিবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এক ক্ষেত্রে নীতিমালা বর্জিত হয়েছিল, অন্য ক্ষেত্রে নীতিমালা পরিমার্জিত হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমি বলব যে, প্রশাসনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রয়োগের জন্যে প্রশাসনিক নীতিমালার পরিবর্তন করা হয় (কিন্তু বর্জন করা হয় না), যখন নীতিমালা গ্রহণযোগ্য অর্থে ভালো হয়। উন্নত দেশে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক পর্ব এভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

২২. Moya, J. N., "Administrative Ethics in an African Society: The Case of Zimbabwe", in Cooper, T. L., *op. cit.*, p. 698.

২৩. জিম্বাবুয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের এই ক্রমধারার বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য, Moyo, J. N., *op. cit.*, pp. 697-701.

যুক্তরাষ্ট্র এবং জিম্বাবুয়ে বিষয়ে উপরে আলোচিত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, একটি রাষ্ট্র উন্নত হোক বা স্বল্পোন্নত হোক — উভয় ক্ষেত্রেই সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের গতিধারাকে চলমান রাখার জন্যে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। একইসাথে এটাও সত্য যে, এমন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ত্রুটিপূর্ণ হলে তা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে ক্ষতিকর হবে — জিম্বাবুয়ের উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত যার প্রমাণ। এই সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যথেষ্ট নয় — এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশেও বর্তমানে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রয়োগ জোরালোভাবে কার্যকর করা হচ্ছে।

পরিশেষে বাস্তবতার এই নিরিখে এটাও বলব যে, বাংলাদেশে বর্তমানে আমাদের একান্তভাবেই প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যার প্রশিক্ষণ ও প্রয়োগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছি; বর্তমানে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থের কম্পিউটার সফ্টওয়্যার আমরা বিদেশে রফতানি করছি। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে ঔষধও রফতানি করা হয়, যা উন্নত প্রযুক্তির মধ্য দিয়েই প্রস্তুত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের এই অর্জনকে মানবকল্যাণে পরিণত করতে হলে এই অর্জনকে সমাজব্যবস্থার সাথে সুসমন্বিত করতে হবে। সমাজব্যবস্থার এই দিকটি প্রশাসনের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হবে। এ কারনেই প্রয়োজন প্রশাসনিক কার্যক্রমের উচিত/অনুচিত দিকগুলোর ক্ষেত্রে সঠিক চিন্তা-চেতনা, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন। এ বিষয়ে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশাবাদী এ কারণে যে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসন-ব্যবস্থাকে বর্জন বা প্রতিস্থাপন করতে হবে না, শুধু পরিমার্জন করতে হবে; আরো আশাবাদের বিষয় হলো, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক ২০১২ সনে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, "মন্ত্রিপরিষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি ইউনিট 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' হিসাবে কাজ করবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উল্লিখিত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করা হবে।"[২৪] এ পরিপ্রেক্ষিতে প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থে ন্যায়পরতা বিষয়ে উপস্থাপিত সক্রেটিসের মতাদর্শের আলোকে বলব, আমরা সবাই আমাদের নিজ নিজ সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থান অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যাব; এটাই হবে আমাদের নৈতিকতা।

২৪. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৪৭।